# ফুলে ফুলে প্রজাপতি

শরীফ আবদুল গোফরান

# ফুলে ফুলে প্রজাপতি

শরীফ আবদুল গোফরান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

# ফুলে ফুলে প্রজাপতি

শরীফ আবদুল গোফরান

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক-প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস-নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম মোবাইল ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস-১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ

৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ একুশে বইমেলা ২০১২

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

মহিউদ্দিন আকবর

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

মূল্য ঃ ১২০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ঃ ৭১৬৩৮৮৫

FULE FULE PROJAPOTI by SHARIF ABDUL GOFRAN

Published by: S.M. Raisuddin, Director-Publication

Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

First Edition 2011, Price: Tk.: 120.00 U$ : 5 ISBN - 984-70241-0045-0

www.pathagar.com

# সূচিপত্র

পড়ন্ত বিকেল -৫
ফুলে ফুলে প্রজাপতি -৯
অশ্রু ভেজা হাসি- ১৫
আকিবের স্বপ্ন -১৭
রমজানের চান -২২
শিমুলতলীর দগ্ধভূমি -২৬
চান্দির মালা -৩০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# পড়ন্ত বিকেল

পড়ন্ত বিকেল। সূর্যের মুখে নীলিমা রেখা। দক্ষিণা ফুরফুরে বাতাস। কাদাভর্তি পথঘাট। রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। সকালেও বৃষ্টি ছিল। থেমেছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। গাছের কদম ফুলগুলো হাসছে। মনকাড়া হাসি। আউশের ক্ষেতে নেমেছে চাষীরা। কখন যে আবার ঢল নেমে আসে! তাই মুঠি মুঠি ধান কাটছে তারা। ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বিলি কেটে কেটে হাঁসেরা সাঁতার কাটছে টইটুম্বুর পানিতে। চারদিকে পানি থৈ থৈ করছে। দূর থেকে কানে ভেসে আসছে কোন এক মাঝির কণ্ঠে গান। সুদূর নীলিমা যেন সব একাকার হয়ে গেছে। আজ কয়দিন পর সামান্য কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামাতে গাঁয়ের সবার মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে। পুকুর পাড়ে বেলগাছ তলায় বর্শি দিয়ে মাছ ধরছে লালু। আদার গেঁথে ফেলতেই টুপ করে চুমাটা ডুবে যায়। আর অমনি লালু ছিপ ধরে টান দেয়। এক একটা টানে একটা করে বড় পুঁটি মাছ। এতক্ষণে ও অনেক মাছ ধরেছে। বর্শি থেকে খুলেই মাটির লোটায় রাখছে। মাটির লোটাটা ভর্তি হয়ে গেছে। গাঁদা-গাঁদি করে খড়খড়িয়ে ওঠে লোটার ভেতর মাছগুলো। লালুর আনন্দ যেন আর ধরে না। আজ মজা করে মাছ খাবে। কবে যে মাছ খেয়েছে মনেই নেই।



www.pathagar.com

ঘর থেকে মা ডাকছে লালুকে। লালু ও লালু, কই গেলিরে বাপ। আমার কাছে আয় বাবা। আমার কেন যেন ভাল লাগতাছে না। ভয় ভয় লাগতাছে। দৌড় দিয়ে ঘরে আসে লালু। আমায় ডাকিছ মা? হ্যাঁ বাপ। আমার কাছে থাক। আমার যে ভাল লাগতাছে না।

আজ সাত আট দিন মা-র খুব অসুখ, ডাক্তার দেখাতে পারেনি। ঘরে টাকা নেই। আয় রোজগার করারও কেউ নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আব্বাকে হারানোর পর মা'কে নিয়ে তাদের দু'জনার সংসার। ঠিকভাবে খাবার জোটে না। মা এ বাড়ি ও বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে যা পায় তা দিয়েই চলে। লালুদের মা-বেটার সংসার। লালু মাছ ভর্তি লোটাটা মা'র সামনে ধরে বলল, দেখছ মা, কত মাছ পাইছি, মজা কইরা খামু। ছেলের মুখে মজা করে খাওয়ার কথা শুনে মা মুচকি হাসলেন। বললেন, বোকা ছেলে! মজা কইরা খাবি, ভাত পাবি কই? আজ ক'দিন মা'র অসুখ হওয়াতে কারো বাড়ি গিয়ে কাজ করতে পারছে না। ফলে ঘরে শূন্য হাঁড়ি।

হ্যাঁ তাইতো? ঘরে যে চাউল নাই। মনে মনে ভাবে লালু। মার অসুস্থ শরীর। ঘরে নেই খাবার। লালুর মন আরো খারাপ হয়ে গেল। কাল রাতে গ্রামের কবিরাজ হরিপাল বাবুর কাছে গিয়েছিল ওষুধ আনতে। বারবার বলার পরও ওষুধ দেয়নি। বরং হরিপাল রেগে গিয়ে বলল, বাপু আমি টাকা ছাড়া ওষুধ দিতে পারবো না। এত মিনতি করার পরও হরিপালের মন গলেনি।

লালুর মাথায় নতুন বুদ্ধি এলো। মাছগুলো বাজারে বিক্রি করে যা হয় তা দিয়ে মা-র জন্য ওষুধ কিনে আনবে। মা-কে তার মনের কথা বললো।

ঃ এ মাছ কয়টা আর কয় টেকা অইবো বাপ। ঘরের চালাখুন দুইডা চাল কুমড়া পাইড়া লইয়া যা। বেইচা যা অয় ওষুধ কিনা বাকিডা দিয়া আধাসের আডা কিনা লইয়া আহিছ।

মা-র কথা শুনে লালুর মনে খুশি যেন আর ধরে না। মাথা নেড়ে সায় দিল।

ঃ হ-মা, তাই করুম। ঘরের চাল থেকে দু'টি বড় বড় কুমড়া কেটে নিয়ে ব্যাগে পুরে ভাঙ্গা ছাতাটা হাতে নিয়ে বাজারে রওয়ানা করলো লালু। এক হাতে কুমড়ার ব্যাগ, আর অন্য হাতে ছাতা ও লোটা ভর্তি মাছ।

বাড়ি থেকে তিন কিলো দূরে কামারহাই। কাদামাখা পিচ্ছিল রাস্তা। হাঁটতে লালুর খুব কষ্ট হচ্ছে। হাটের কাছাকাছি যেতেই দেখা হলো নিখিল বাবুর সাথে। নিখিল বাবু লালুকে দেখেই ডাক দিল।

এই ছোকরা, তোর ব্যাগে কিরে? বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো লালুর। ভয়ে ভয়ে বললঃ

কিছু মাছ আর দুইডা চালকুমড়া বাবু। নিখিল বাবু লালুর হাত থেকে মাছ আর কুমড়ার ব্যাগটা নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা ধরলো। লালু টাকার কথা বলতেই ধমক দিল।

তোর এত বড় সাহস! আমার কাছে কেউ এভাবে টাকা চায়? যা- কাল দেখা করিস। নিখিল বাবু এলাকার একজন মেম্বার। সবাই ভয় পায় তাকে। কামার হাটের খাজনা থেকে শুরু করে সব রকম বখরার মালিক তিনি। তার কাছে কোন জিনিসের বিনিময় চায় এ সাধ্য কার আছে?



www.pathagar.com

আনমনে টপ টপ করে কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো লালুর চোখ থেকে। কিন্তু নিখিল বাবুর মন গলল না। অগত্যা শূন্য হাতে বাড়ির পথে রওয়ানা করলো লালু।

মগুয়া বিলের পাশ ঘেঁষে লালুদের বাড়ির রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে কানায় কানায় পানি। শাপলা, পদ্ম, আরো অনেক নাম না জানা জলজ ফুলে শোভিত হয়ে থাকে বিলটা। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাঁতার কাটে বালিহাঁস আর জলজ পাখিরা। সকাল সন্ধ্যায় বিলের ওপর দিয়ে কৌনিক সারিতে ঝাঁক বেধে সাদা বকেরা উড়ে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট নৌকা ভেসে যায় বিলের ওপর দিয়ে। সারা বিলের মধ্যে ডাহুকের ডাক। বিলের পাড় থেকে তাকালেই দেখা যায় লালুদের বাড়ি। বাড়ির ভেতর একটি কুঁড়ে ঘর। দূর থেকে মনে হয় নির্জন। এ বাড়িতেই বাস করে লালু আর তার মা হিরামন।

লালু কাদার ভেতর পিছলা কেটে কেটে হাঁটছে। রাস্তা যেন আর শেষ হয় না। মা'র কথা মনে হতেই তার বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে উঠেলো। এর মধ্যে সূর্যটাও লুকিয়ে গেল। চারদিকে আবার অন্ধকার হয়ে আসছে। অনেক কালো মেঘ জমেছে। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া উড়ু-উড়ু মেঘ। মেঘেরা যেন আকাশে খেলা করছে। মেঘের পাহাড় ভেঙ্গে বাতাসের ঢেউ বেয়ে নামে বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। সাতদিন হয়ে গেল থামার কোন লক্ষণই নেই। মাঠ-ঘাট ডুবে গেছে। সদর রাস্তায়ও উঠে গেছে পানি। নিচু এলাকার বাড়িঘরেও পানি উঠেছে। ঘরের ভেতরটা পানি ছুঁই ছুঁই করছে। লালু ভাঙ্গা ছাতাটা মাথার উপর ধরেছে ঠিকই কিন্তু বৃষ্টির পানিতে তার সমস্ত শরীর ভিজে চুপ চুপ করছে। বাতাস আর বৃষ্টির পানিতে ভিজে একাকার হয়ে যায় লালু। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। এর মধ্যে পুবের পানি নামতে শুরু করেছে। সারা গাঁ ডুবে গেছে। রাস্তাঘাট সব একাকার। লালুদের বাড়িতেও পানি।

চৈতার খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে লালু। মগুয়া বিলের ঢেউ গিয়ে ঝপাঝপ ধাক্কা খাচ্ছে তাদের ঘরের চালে। পানির ঢেউয়ের সাথে ভেসে যাচ্ছে ঘরের চালার খড়কুটো। লালুর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো। বিড় বিড় করে বলছে, মা-র যে কি হলো! লালু অন্ধকার রাতে হাট থেকে ফিরে চৈতার খালের পাড়ে এসে মা বলে ডাক দিতো। আর অমনি আইতাছি বলে মা হুড়মুড় করে কুপি হাতে নিয়ে এসে পড়তো খালের পাড়ে। লালুকে জড়িয়ে ধরে মা বলতো, আমি এখনো ঘুমাইনি বাপ। এত দেরি করলি ক্যান? কিন্তু আজতো কোন শব্দ নেই। তাহলে কি মা নেই! অনেক পানি ভেঙ্গে লালু বাড়ি এসে দেখে ঘরের চালা পর্যন্ত পানি। তার মা আর বেঁচে নেই। কেউ থাকলো না আর লালুর। ঢলের পানিতে মা-র মৃত্যু হয়েছে। রাতের আঁধার নেমে এসেছে। চারদিক থেকে পানির ঢেউ এসে লালুদের ঘরের চালে ধাক্কা খাচ্ছে। আস্তে আস্তে পানিও বাড়ছে। মা-র লাশটি ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে মগুয়া বিলের দিকে। অনেক চেষ্টা করেও পানির স্রোতের সাথে যুদ্ধ করে লাশটি রক্ষা করতে পারলো না সে। তার পাশ দিয়েই একটি কলাগাছ ভেসে যাচ্ছিল। লালু কলাগাছটিকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর কি হলো সে আর বলতে পারে না। সে যেন জ্ঞান শূন্য হয়ে গেল। এক সময় ভাসতে ভাসতে কলাগাছটি



www.pathagar.com

সদর রাস্তায় বড় বটগাছটার পাশে গিয়ে ভিড়লো। পানির ঢেউয়ের সাথে দুলছে লালু আর কলাগাছ। এইমাত্র বৃষ্টি থেমেছে। আকাশটা হঠাৎ করে পরিষ্কার হয়ে গেল। লালুরও একটু একটু জ্ঞান এসেছে। সে কাদা-পানিতে পড়ে আছে। শরীরে শক্তি নেই। উঠতে পারছে না। বটগাছের চারদিকে পিঁপড়া আর পোকামাকড় কিলবিল করছে। তবুও হাতে ভর করে লালু চৌরাস্তার মোড়ে বুড়ো বটগাছটার তলায় গিয়ে বসে। চারদিকে পানি আর পানি। যেন নূহের বন্যা। অঝরে কাঁদছে লালু। বিষণ্ন চেহারা। বয়স আর কত হবে! বড়জোর বারো-তেরো। এই বয়সের একটি বালক কোথায় যাবে! কার কাছে সে আশ্রয় নেবে! দু'গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে লালুর।

বেলা বাড়তেই পেটের খিদেটা মোচড় দিয়ে ওঠে লালুর। গত রাতেও পেটে দানাপানি পড়েনি। খিদেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছে। বটগাছের পাশ দিয়ে ছল্লাত ছল্লাত করে বৈঠা টেনে ছোট্ট একটি নৌকা নিয়ে যাচ্ছে মাঝবয়সী এক লোক। দূর গাঁয়ে তাদের বাড়ি। লালুর কান্না শুনে নৌকাটা কিনারে ভিড়িয়ে থমকে দাঁড়ালো লোকটি। জিজ্ঞাস করলো,

ঃ কি হয়েছে বাবা, তুমি কাঁদছ কেন, তোমাদের বাড়ি কোন গাঁয়ে? তোমার বাপ মা কেউ নেই? লোকটির কথায় লালু ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। লালুর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে লোকটি আবার বললো,

ঃ তোমার ভয় নেই বাবা, কাঁদছ কেন বলো! আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবো।

সব কথা খুলে বললো লালু। লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরলো। অতি আদরে লোকটির বুকে মাথা গুজে দিল লালু। সম্বিত ফিরে আঁৎকে উঠলো লালু। কে এই লোকটি? এত ভাল মানুষ! আব্বার কথা মনে পড়ে যায় তার। ছোট বেলায় কোন কিছুর জন্য বায়না ধরে কাঁদলে আব্বা তাকে এমনিভাবে জড়িয়ে ধরতো। অকস্মাৎ লালু বললো,

আপনি কে? আমাকে এত আদর তো কেউ কখনো করেনি! আপনি এত ভাল মানুষ? লোকটি বললেন,

ঃ জান বাবা! আমাদের নবীজী বলেছেন, এতিমকে ভালবাসতে হবে। এটা নবীর শিক্ষা। চলো আজ থেকে আমিই তোমার বাবা। তা হলে তো আর তোমার দুঃখ থাকার কথা নয়। এই বলে লোকটি লালুকে হাত ধরে নৌকায় তুলে নিলেন। বাড়ি নিয়ে তিনি তার স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, এইতো তোমার মা। সেই থেকে লালুর আর কোন দুঃখ রইলো না। আস্তে আস্তে সব দুঃখ ভুলে গেল সে। তাদের আদর-যত্নে দিন দিন বড় হতে লাগলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, নবীর শিক্ষা পেয়ে যে মানুষ এত দয়ালু হতে পারেন, তাহলে আমাদের নবীজী কত দয়ালুই না ছিলেন! আমার মত এতিমদের কত আদরই না করতেন তিনি!



www.pathagar.com

# ফুলে ফুলে প্রজাপতি

শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের আবদার মেনে নিলেন রফিক। ওদের আবদার এবার গ্রামে যাবে। গ্রামেই ঈদ করবে। বাবা রফিক এই আবদার মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ তিনি হিসাব করে দেখেন, মাত্র সামান্য কয়টি টাকা আয় হয়েছে। এই টাকা খরচ করে গ্রামের বাড়ি গেলে সারা মাস না খেয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া ঋণ করলে তা শোধ করবেন কিভাবে! রফিক একজন লেখক। সবাই কবি বলে জানে। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করে যা পায় তা দিয়ে কোনমতে চলে অভাবের সংসার। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। সাইফ আর সাদিয়া। সাঈফ বড় আর সাদিয়া ছোট।

গত কয়েক বছর পরিবারের কেউ গ্রামের বাড়িতে ঈদ করেনি। কোথাও যেতে হলে তো একটা ছোট-খাটো বাজেটের প্রশ্ন আসে। অন্তত মা'র জন্য তো একটা কাপড় নিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া সাদিয়া বারবার নতুন জামার জন্য বিরক্ত করছে। অবশ্য সাইফ বলেছে, বাবা আমার নতুন জামা কিনা লাগবে না। সাঈফ এখন একটু বড় হয়েছে। সে বাবার কষ্ট বোঝে। সাদিয়া তো ছোট। এখনো তার বুঝার বয়স হয়নি। ফলে সে শুধু বাবাকে বিরক্ত করে। বাবা সাদিয়াকে খুব ভালবাসে। ফলে তার আবদার রক্ষা না করে নিস্তার নেই।



www.pathagar.com

সেই ত্রিশ বছর আগে গ্রাম ছেড়েছেন রফিক। তারপর খুব একটা গ্রামে যাওয়া হয় না। শুধু বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে গিয়েছিলেন। তার তিনদিন পর আবার চলে এসেছেন। এই শহরে যারা বসবাস করছে তাদের বেশির ভাগ লোক গ্রাম থেকে এসেছে। কিন্তু সবাই দালানে বাস করে। ফলে অনেক টাকা বাসা ভাড়া বাবদ খরচ হয়ে যায়। গ্রামে যারা ছন-টিনের ঘরে বাস করে তাদের কি রাতে ঘুম হয় না? হয়। হয়তো বৃষ্টি এলে ভাঙ্গা চালের ছিঁদ্র দিয়ে পানি পড়ে ঘরে। আর শহরে যারা বিল্ডিং-এ থাকে, ঝড় বৃষ্টি হলে একটা পাতলা চাদর টেনে নাক-ঢেকে আরামে ঘুমায়।

তবু সব মানুষের অতীত আছে। রফিক সাহেবেরও অতীত ছিল। তিনিও যে গ্রামের মানুষ। একদিন ঘুম ভাঙতো পাখির গানে আর মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা আযানের শব্দে। তারপর মধুমতির কিনারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তালপিয়ালের বনে পাখিদের সাথে কথা বলতেন। ফলে মনটা তার গ্রামে টানে। দু'নয়নে গ্রামটাকে দেখতে মন চায়।

এ নিয়ে চিন্তিত রফিক। হিসাব মিলাতে পারছেন না। আসা-যাওয়ায় কম করে হলেও এক হাজার টাকার প্রয়োজন। তার ওপর আনুষঙ্গিক খরচ। রফিক সাহেব নিজেও অসুস্থ। একটু চিন্তা করলেই রক্তচাপ বেড়ে যায়। চিন্তা তো এমনিতেই চলে আসে। কারণ সামান্য লেখালেখির টাকা দিয়ে তো আর সংসার চলে না। সারাদিন খাটুনির পরও মাস শেষে ঘাটতি পূরণ করতে পারে না। আজও টাকার জন্য ওষুধ কিনতে পারেনি। বাকী নেবার দোকানটাও বন্ধ। ফলে রক্তচাপ অনেক বেড়ে গেছে। যতক্ষণ রাজুদের সাথে ছিল ততক্ষণ কিছুটা ভাল লেগেছে। বাড়ি ফিরতেই আবার সব চিন্তারা গিজগিজ করে ধরেছে। ফলে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিল।

চোখে ঘুম নেই। গ্রামের অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মরহুম আব্বা, মা আর ছোট বোন ফাতেমার কথা। ফাতেমার কথা মনে পড়তেই চোখ থেকে দু'ফোঁটা নোনা পানি গড়িয়ে পড়লো।

সেদিন ছিলো ধুলোটে আকাশ। ঠিক মাথার ওপর সূর্য। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। তাকানো যায় না। চোখ জ্বালা করে। ছোট বোন ফাতেমা বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে। অসুখী এক চেহারা। দুটো চড়ুই দরজার সামনে বেশ লাফলাফি করছে। চড়ুই পাখির মতোই দুরন্ত ছিল ফাতেমার মন। এ পাড়া ও পাড়া কত ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ সে বড় একা। অসুস্থতার কাছে সে বন্দী। ধুলো-মাটি মাখানো শরীর নিয়ে বাবা এলেন মাঠ থেকে। গরু দু'টো গোয়াল ঘরে বেঁধে ঘরের কোণায় আম গাছটার নিচে এসে বসেন। মা আগেই গামলার পানিতে খড় ভিজিয়ে রেখেছিলেন। খানিক বিশ্রাম নিয়ে গায়ের গেঞ্জিটা খুলে রাখেন কাঁধে একটা লুঙ্গি আর গামছা ফেলে নদীতে চলে যান গোসল করতে।

মা রান্নার কাজ সেরেছেন অনেক আগেই। ঘর-দুয়ার ঝাড় দেয়াও শেষ হয়ে গেছে। মাটির



www.pathagar.com

কলসটা হাতে নিয়েছেন মা। গোসল করতে যাবেন। এ সময় রফিক ঘরে ঢুকেছেন। কাঁধে ঝুলানো একটি ব্যাগ। দু'মাস পরে বাড়ি আসা। সে মাগুরা শহরের একটি কলেজে পড়ে। রফিককে দেখে ফাতেমা চিৎকার করে ওঠে। ভাইয়া তুমি আইছ!

রফিক ফাতেমাকে আঁকড়ে ধরে। তোর চেহারা এমন হইছে ক্যানরে ফাতু? জিজ্ঞেস করে রফিক। ফাতেমা উত্তর করে না। ফুঁফিয়ে কাঁদে। ফাতেমার শরীর ঘাম জমে আছে। কিন্তু তখনো তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর।

বাবা গোসল সেরে এসেছেন। ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে রফিককে নিয়ে খেতে বসেছেন।

চোখের কোণে পানি চিক চিক করছে। কান্না চাপতে না পেরে বাম হাতে লুঙ্গি দিয়ে চোখ মোছেন। রফিক বাবার কান্নার ভাষা বুঝতে পারে। টাকার জন্য ফাতেমার চিকিৎসা করতে পারছেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে রফিক বলে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না বাবা। ফাতুর অসুখ সেরে যাবে। আমার কাছে পাঁচ'শ টাকা আছে। আমি টিউশনি করে পেয়েছি। আমার আজকে আসার ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ সবার কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন স্বপ্নে দেখি ফাতু আমাকে বলছে, ভাইয়া তুমি নাই দেখে বাপজানের খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।



www.pathagar.com

রফিকের কথা শুনে বাবা-মার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। ফাতেমা বিছানায় শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখে। তারপরও বলেঃ ভাইয়া একটা কথা বলবো–

ঃ কি বলবি বল।

ঃ আমার না নতুন জামা পরতে ইচ্ছা করছে। এবার ঈদে একটি নতুন জামা নিন্না দিবা।

প্রতিউত্তরে রফিক কিছু বলার আগেই ফাতেমা মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর শরীর। রফিক পায়ের নিচ থেকে ভারী কাঁথাটা টেনে ফাতেমার গায়ে জড়িয়ে দেয়।

এক সময় বিকেল গড়িয়ে সাঁঝ নেমে আসে। ছাই রং আকাশ। সূর্য লাল আভা ছড়িয়ে চোখের অন্তরাল হয়েছে। দূরের পাখিরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বাইরে মায়াবী জোসনা নীরব প্রকৃতি। মানুষজনেরও কোন সাড়া-শব্দ নেই। উঠোন দিয়ে শেয়াল দৌড়ে যাওয়ার শব্দ হয়। ঝিঁ ঝিঁ পোকার তেমন ডাক শোনা যাচ্ছে না। রাত কত হবে সঠিক করে বলা মুশকিল।

চাঁদ কিছুটা পশ্চিমাকাশে হেলে গেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকছে। মা ফাতেমার মাথায় পানি ঢালছেন। রফিক বসে আছেন ফাতেমার পাশে। হঠাৎ জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে ফাতেমা। সেই সাথে বড় বড় চোখ করে পা খিঁচুতে থাকে। মা কাঁদছেন। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে। রফিক দৌড়ে যায় ডাক্তার বাড়ি। উঁচু-নিচু জমির মাঝখান দিয়ে ছুটে চলে। স্নিগ্ধ বাতাস এসে হোঁচট খায় রফিকের নাকে-মুখে। মাঝে মাঝে শক্ত মাটির ঢেলায় পা ফসকে যায়। তবু দৌড়ে ছোটে।

আকাশে হালকা মেঘ। বাতাসে ভেসে বেড়ায় আর চাঁদের সাথে লুকোচুরি খেলে। অন্যদিন হলে রফিক আকাশের দিকে তাকিয়ে খেলা দেখতো। কবিতা লিখতো। উঁচু-নিচু জমি পেরিয়ে রফিক বড় রাস্তায় পা রাখে। হাঁপাতে হাঁপাতে রফিক ডাক্তার নলিন বাবুর বাড়ির উঠানে পা রাখে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসে। ঘরের ভেতর থেকে বুড়ো মানুষের গলার আওয়াজ। নলিন দেখতো বাইরে কুত্তাডা এমন ঘেউ ঘেউ করছে কেন? চোর আইছে নাকি?

রফিক উত্তর দেয়, চোর না। আমি গোপালনগরের রফিক। নলিন দা আছেন? আমার বোনের খুব অসুখ, আমার সাথে একটু যেতে হবে। ঘরের ভেতর থেকে নলিন বাবুর জবাব, না বাবু এত রাতে আমি যেতে পারবো না।

রফিক গোঁখরো সাপের মতো ফুঁসতে থাকে। সারা শরীর রি-রি করে। এই গ্রামে একটাই ডাক্তার। তাও তাকে প্রয়োজনে পাওয়া যায় না। রফিক অসহায় হয়ে বাড়ির পথে ছুটলো। বাড়ির কাছাকাছি এসে তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ শুনতে পায়। ও বুঝতে পারে ফাতেমা আর নেই।

এমন ধরনের কত স্মৃতিই না রফিকের মনে পড়ছে। রাতও অনেক হয়েছে। চোখে ঘুম নেই। মাথা এবং ঘাড় টনটন করছে। রক্তচাপ আরো বেড়ে গেছে। মনে মনে ভাবে শরীর এমন খারাপ করলে সকালে বের হবে কি করে। তবু যে তাকে বের হতে হবে। লেখার বিলগুলো সংগ্রহ না করলে তো আর ঈদের পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এক সময় মসজিদের



www.pathagar.com

মিনার থেকে ভেসে আসে আযানের মিষ্টি শব্দ, আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান-নাউম। বাইরে পাখিরা কিচিরমিচির করছে। বিছানা ছেড়ে উঠেন রফিক।

যথারীতি অন্যদিনের মতো প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রফিক। সারাদিন ঘুরলেন। কিন্তু ঈদের পরিকল্পনা করার মতো টাকা তার হাতে আসেনি। ভাঙ্গা মন নিয়ে ফিরে আসেন ঘরে। সাদিয়া এসে জড়িয়ে ধরলো,

ঃ আব্বু আমাকে লাল জামা কিনে দিতে হবে,

ঃ মাথা নেড়ে বললেন রফিক, হ্যাঁ মা অবশ্যই দেবো।

ঘরে স্ত্রী মহসেনা আর একমাত্র ছেলে সাঈফ ছাড়া আর কেউ নেই। হঠাৎ রফিক মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। স্ত্রী মোহসেনা রফিককে বেবী-টেক্সিতে নিয়ে অনেক হাসপাতালে গেলেন। কিন্তু কোথাও সিট পাওয়া গেল না। অবশেষে তার এক বন্ধু ডাক্তারের কাছে নিয়ে হাজির হয়। ডাক্তার বন্ধু বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। মোহসেনা বুঝতে পারে রফিক আর নেই। পরদিন সকালে ছড়িয়ে পড়লো, কবি রফিক আর নেই। পত্রিকার পাতায় বড় বড় ছবি ছাপা হলো। টেলিভিশনেও দেখানো হলো। দেশব্যাপী শোকের ছায়া। সবার মুখে একই কথা হিজল বনে পালিয়ে গেছে পাখি।

এক এক করে রমজান মাসও শেষ হয়ে গেল। কাল ঈদ। সাঈফদের বাসায় ঈদের কোন কর্মসূচি নেই। বাবার বন্ধুরা একে একে এসে দেখা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কারো মনে অনন্দ নেই।

পাশের বাসায় দীপু সাঈফকে ডেকে নিয়ে গেল ছাদে। ওরা ঈদের নতুন চাঁদ দেখবে। চাঁদ দেখার দারুণ উত্তেজনা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল আরো অনেকে। সাঈফ ও দিপুকে দেখে সবাই খুশি। কিন্তু সাঈফের মনে যে আনন্দ নেই। বার বার বাবার কথাই মনে পড়ছে। বাবা থাকলে আজ কত মজাই না হতো। ঈদের নতুন গান লিখতেন। বলতেন সাঈফ দেখি গতবারের ঈদের গানটা গা তো!

পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে আছে। টুকরো মেঘের রঙিন ভেলা বিদায়ী সূর্যের ঘাটে ভীড়ে আছে। এক সময় মেঘ কেটে গেল। পরিষ্কার আকাশে উঁকি মারলো নতুন চাঁদ। সবাই খুশিতে হই হই করে উঠলো। সাঈফ মলিন মুখে বাসায় চলে এলো। ঘরে কারো মুখে হাসি নেই। ছোট্ট সাদিয়া বারবার বলছে, ভাইয়া আব্বু ঈদের জামা নিয়ে কখন আসবে? সাদিয়া জানে না আব্বু যে আর কখনো ঈদের জামা নিয়ে ফিরে আসবে না। সাঈফ সাদিয়াকে বুঝাতে বুঝাতে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

আজ ঈদ। চারদিকে অফুরন্ত আনন্দ। প্রকৃতিও যেন আনন্দে বিভোর। বাগানে সবচেয়ে বড় জবার কুঁড়িটা তার পাপড়ি মেলে দিয়েছে। যেন তার প্রিয় কবিকে ঈদ মোবারক জানানোর জন্যই সে আজ জেগে উঠেছে। ছোট্ট ছোট্ট চড়ুই পাখিগুলো জানালার ধারে এসে কিচিরমিচির ডাকছে। আর যেন বলছে, কইগো কবি জেগে ওঠো, আমাদের সাথে আনন্দে শরিক হও।

পাখিদের মিষ্টি ডাকে সাঈফ জেগে উঠলো ঘুম থেকে। সাদিয়ারও ঘুম ভেঙ্গেছে। সাদিয়া



www.pathagar.com

আম্মু আর ভাইয়াকে বিরক্ত করছে।

ঃ আম্মু আব্বু কই! আমার নতুন জামা কই!

মা মোহসেনা কুরআন শরীফ পড়ছেন। চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে। সাঈফ বাগানের ধারের জানালাটার পাশে সাদিয়াকে নিয়ে বসে বসে ফুটন্ত গোলাপের শরীর থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়া শিশিরকণা দেখছিল। মনে হয় যেন ফুলেরা চোখের পানি ছেড়ে কেঁদে কেঁদে সাদিয়াকে বলছে, ওগো, ফুলের কবি পাখির কবি আসে না আর কেন! এর মাঝে একটি প্রজাপতিও গিয়ে ফুলের গায়ে বসলো। যেন তারা গলাগলি করে তাদের প্রিয় কবির বিয়োগ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়েছে। প্রজাপতি দেখে সাঈফের বাবার লেখা গত ঈদের ছড়াটা মনে পড়লো। সে প্রজাপতি ছড়াটা আবৃত্তি করে ফুল আর প্রজাপতিদের শুনাতে লাগলো। সাদিয়াও যেন তন্ময় হয়ে বাবার লেখা প্রজাপতি ছড়াটি উপভোগ করছে। মনে হয় এটাই তাদের সবার জন্য ঈদের পুরস্কার ঃ

"প্রজাপতি প্রজাদের খোঁজ কিছু নিও
ঈদ এলে হাতে হাতে ঈদ কার্ড দিও।"

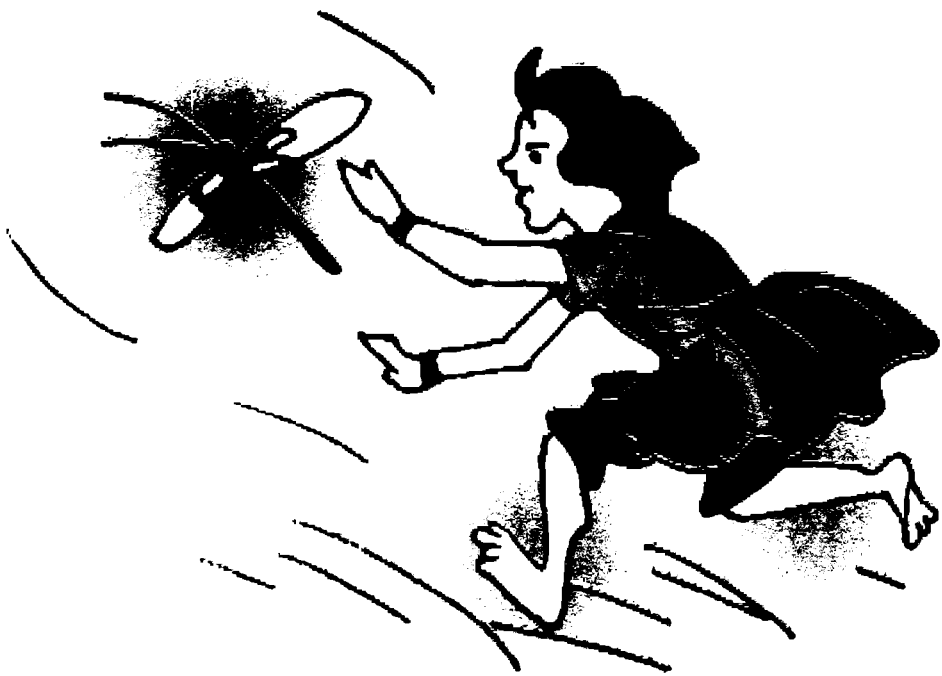



www.pathagar.com

# অশ্রু ভেজা হাসি

মাসুদ আর ইমন দুই বন্ধু। ওরা দু'জন একই পাড়ায় বাস করে। ওরা একজন অন্যজনকে ছাড়া থাকতে পারে না। ওদের বাবা-মা'দের সাথেও খুব মিল। যেন আত্মীয়তার বন্ধন। গত বছর ইমন গাছ থেকে পিছলে পড়ে গেলে তার পা কেটে যায়। মাসুদ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ওরা দু'জনে একই স্কুলে পড়ে। ওদের স্কুলে এখনও ঈদের বন্ধ। এবার ঈদে ওরা খুব মজা করেছে। দু'জনে মিলে খুব আনন্দ করেছে। বিশেষ করে কোরবানীর ঈদ এলে দু'জনে খুব মজা করে। ওদের পছন্দ লাল গরু। তাই ওরা দু'জনে বড়দের সাথে গরু কিনতে বাজারে যায়। ঠিকই বাজার থেকে একটি বড় লাল গরু কিনা হলো। কিন্তু আনন্দে হঠাৎ ভাটা পড়ে যায়। দু'জনের মধ্যে সামান্য কারণে ফাটল ধরে। ঘটনা তেমন কিছু নয়। সেদিন ওরা দু'জন মিলে কোরবানীর গরুটাকে ঘাস খাওয়াতে লাগলো। ঠিক হলো, গরুটি মাসুদদের বাড়িতে থাকবে। যেই কথা সেই কাজ।

কিন্তু গরুটি বাড়ি আনা মাত্র মাসুদের আম্মু ওর ওপর ভীষণ রেগে গেল। তিনি গরুটিকে তৎক্ষণাৎ ইমনদের বাড়ি রেখে আসতে বলেন। বাধ্য হয়ে মাসুদ গরুটিকে ইমনদের বাড়িতে রেখে আসে।



www.pathagar.com

এতেই ইমনের সাথে ওর ভুল বুঝাবুঝি হয়। মাসুদ এতো করে বুঝিয়ে বলে, আম্মু রাগ করেছে এজন্য রেখে গেলাম। তবুও সে ওকে ভুল বোঝে। শেষে ওর সাথে আড়ি দিয়ে চলে যায়। এর পর আর দেখাই করে না। ইমন এতে খুব দুঃখ পায়। অবশ্য পরে ইমন নিজের ভুল বুঝতে পারে। নিজে নিজে সে অনুতপ্ত হয়। মাসুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ওর মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু লজ্জায় দেখা করতে পারে না।

এমনি করে দু'তিন দিন কেটে যায়। আসলো ঈদের দিন। খুশির জোয়ার নিয়ে আসে অনাবিল ঈদ। চারদিকে সে কি আনন্দের ঢেউ। সকালে মাসুদ ও ইমন একই মাঠে ঈদের নামাজ পড়তে যায়। নামাজ শেষ। সবাই কোলাকুলিতে ব্যস্ত। কিন্তু ওদের দু'জনের মনই শুধু খারাপ। ওদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আনন্দের লেশ নেই। এক পর্যায় সামনাসামনি দু'জনের দেখাও হয়ে গেল। একে অপরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তবুও কথা বলতে পারে না কেউ। কিন্তু এভাবে ঈদের দিনে কথা না বলে আর কতক্ষণই বা থাকা যায়? মাসুদ নিজেকে সামলাতে পারে না। সবাই কোলাকুলি করছে অথচ ওদের এ ছাড়াছাড়ি। –নাহ! সে সব কিছু ভুলে গিয়ে এক্ষুণি ইমনের সাথে কোলাকুলি করবে। ওর দু'চোখে পানি এসে যায়। এরই মধ্যে ইমনও দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেঃ এসো বন্ধু, আর অভিমান নয়। হিংসাও নয়। মাসুদ অমনি জড়িয়ে ধরে ইমনকে। তারপর কিছু সময় কেটে যায় অশ্রুভেজা দু'জনের হাসিতে।

www.pathagar.com

# আকিবের স্বপ্ন

আরিফ আর আকিব দুই বন্ধু। একই মেসে থাকে দু'জনে। দু'জই ছাত্র। আরিফ পড়ে আই, এ ক্লাসে আর আকিব এবার পলিটেকনিক থেকে পাস করে বের হলো। সে কাক-ডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চাকরির সন্ধানে গোটা চাটগাঁ শহরটাকে চষে বেড়ায়। ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজ বিক্রি করে। আর সন্ধ্যায় টিউশনি। এ থেকে যা পায় নিজে চলে, আবার আব্বা-আম্মুর জন্যও কিছু পাঠায়। আরিফ ও আকিবের সাথে খবরের কাগজ বিক্রি করে। আকিবদের বাড়ি কুমিল্লার এক পল্লীতে। গ্রামের নাম শিমুলপুর। মা-বাবা আর ছোট এক বোনকে নিয়ে তাদের সংসার। ওরা খুব গরিব। বাবা জীবিতকালে খুব কষ্ট করে সংসার চালাতেন। গাঁয়ের তালেব মাস্টার একদিন বাবাকে ডেকে বললেন, তোমার ছেলেটা খুব ভাল। তাকে লেখাপড়া শিখাও, দেখবে সে একদিন অনেক বড় হবে। দেশ-জোড়া মানুষ হতে পারবে। বাবা তাই করলেন। আকিবকে তালেব মাস্টারের পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। আকিবের একমাত্র বোন মরিয়ম। সে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। বাবার বয়স বেড়ে গেছে। এখন আর আগের মতো শ্রম দিতে পারে না। ফলে আয়-রোজগারও কমে গেছে। এজন্য আকিবকে অনেক চিন্তা করতে হতো। বাবার চিন্তা ছিল, আকিবকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তিনি অবসর নিবেন। কিন্তু তা আর ভাগ্যে



www.pathagar.com

জোটেনি। নানা চিন্তায় বাবা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এক সময় তিনি চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেলেন। এখন মা আর মরিয়মের একমাত্র ভরসা আকিব। আকিবকেই হাল ধরতে হলো সংসারের। মা সারাক্ষণ নামাযের বিছানায় বসে থাকেন। দু'হাত তুলে আকিবের জন্য দোয়া করেন।

রমজান মাস। আকিব প্রতিদিনকার মত তারাবির নামায শেষ করে বাসায় ফিরেছে। তারাবির পর প্রতিদিন সে কুরআন, হাদিস, ইসলামী সাহিত্য পড়ে থাকে। তারপর ঘুমাতে যায়। আজও তাই করলো। সারাদিন পরিশ্রম করায় খুব ক্লান্তি লাগছে। শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিল। চোখে মোটেও ঘুম নেই। অনেক কথা মনে পড়ছে। আজ মা-র চিঠি পেয়েছে। মা লিখেছেন,

'বাবা আকিব, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে। আমি আজকাল তোমার চিন্তায় ঘুমাতে পারি না। ঘুমের ঘোরে নানা স্বপ্ন দেখি। বাপ, সাবধানে থেকো। দেশের পরিস্থিতি ভাল নয়। তোমার কিছু হলে আমি কিভাবে থাকবো। লোকেরা বলে দেশে নাকি খুব গণ্ডগোল হবে। তোমার তো অনেক শত্রু। সুলতান মৌলভীর কাছে প্রায় শুনি ভাল কাজ যারা করে তাদের শত্রু বেশি থাকে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে পথ চলবে'। এসব কথা মনে হতেই আকিব বিড় বিড় করে বলে, এমন হলে তো ভালই হয়। আমি শহীদ হতে পারবো। আর তুমি হবে শহীদের মা। মাত্র হাতে গোনা দু'দিন পর ঈদ। অনেক টাকার প্রয়োজন। মায়ের জন্য একটা কাপড় তো নিতে হবে। বাড়ি থেকে আসার সময় মরিয়ম বলেছে, ভাইয়া আমার জন্য ঈদে লাল জামা আনতে হবে কিন্তু। ঐ যে তালেব মিয়ার মেয়ে হাফিজা পরে ঐ রকম জামা। তালেব মিয়ারা তো অনেক ধনী। মরিয়ম তো ছোট মানুষ। জানে না তাদের যে অনেক টাকা আছে। কিন্তু যাই হোক, মরিয়মের আবদার রক্ষা না করলে ওর কান্না থামানো যাবে না। মরিয়মের কথা মনে হতেই আকিবের বুকের ভেতর ছেৎ করে উঠলো। ভাবতে ভাবতে একসময় কত কথাই না মনে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো। একদিনের ঘটনা–

আকিব, তোমার না কাইলকা পরীক্ষা?

কাল পরীক্ষা নেই মা।

–তা হলে কবে?

–পরশু দিন।

–কাইলকা আর পরশুদিনের মাঝে তফাত নাই। যাও পড়তে যাও।

আকিব পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। তারপর পড়তে শুরু করে। গুন গুন করে পড়ছে।

এক সময় বই খোলা রেখেই চোখ বন্ধ করে চেয়ারে দুলুনি খেতে থাকে। পাশ থেকে চিমটি কাটে মরিয়ম।

–কিরে ভাইয়া। পড়ছিস না ক্যান?

–কে বলল পড়ছি না?



www.pathagar.com

–কেউ বলেটলেনি। আমি দেখি তুই বই বন্ধ করে দিব্বি বসে আছিস।

–দাঁড়া বান্দর, দেব ধরে চড়।

–দে, চড় দিয়ে দেখ না।

সত্যি সত্যি চড় মেরে বসে আকিব। চড় খেয়ে মরিয়ম ফোৎ ফোৎ করতে থাকে। কাঁদে কিন্তু জোরে না। এমন কি বলেও না কাউকে কিছু। আকিবের হাতে হাজার পিটুনি খেলেও মরিয়ম কখনো নালিশ করে না। চুপ করে থাকে। কাঁদে লুকিয়ে লুকিয়ে। আকিবও খুঁজে পায় না তার ক্লাস থ্রি পড়ুয়া বোনটি এতো ভাল কেন। মরিয়মকে নিঃশব্দে কাঁদতে দেখে আকিবের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। তার ইচ্ছা হয় মরিয়মের কাছে মাফ চায় সে। বসা থেকে উঠলো আকিব। মরিয়মের চোখের পানি মুছে দিল। কান্না থামাতে বললো। কাঁদিস না বোন। ভাইয়া তোকে আর কখনো মারবে না। আয় তোকে গল্প শোনাবো। মরিয়ম প্রায়দিন আকিবের কাছে গল্প শোনে। গল্পের কথা শোনে কান্না থেমে গেল। আজই আকিব 'ঈদের খুশির ওপর' একটি বই পড়েছে। ঐ বইয়ের একটি ঘটনা মরিয়মকে শোনাতে লাগলো।

সেই অনেক অনেক দিন আগের কথা। রমযান মাস। ১৭ই রমযান মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে স্থানের নাম বদর প্রান্তর। এ কারণে এই যুদ্ধকে বদর যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়। তখন চারিদিকে কি আনন্দ। মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের বিজয়ে পতাকা উড়িয়ে মদীনায় গেলেন। মদীনাবাসিরা "রাওয়া" নামক স্থানে নবী (সা)-কে বিপুল সংবর্ধনা দেন। বিজয়ের আনন্দে তখন সবাই উৎফুল্ল। তখন আমাদের মহানবী (সা) ২৭ বা ২৮ রমজান ঘোষণা করলেন, এক মাস রোযা শেষ হলেই আমরা উৎসবের আয়োজন করবো। আর ঐ দিনটি হবে মুসলমাননের পবিত্র ঈদুল ফিতর। তাইতো বদরের যুদ্ধের ১৩ দিন পর অর্থাৎ ৬১৪ খ্রিস্টাব্দ ১লা শাওয়ালে ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে। আর ঐ থেকেই মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকে। এক সময় গল্প শুনতে শুনতে মরিয়ম ঘুমিয়ে পড়ে।

আরো কত কি ভাবনা জমা হয়েছে আকিবের মনে। মাকে চিঠি লিখেছে, ঈদের একদিন আগেই বাড়ি আসবো। মরিয়মকে বলবেন, ওর জন্য লাল জামা নিয়ে আসবো। সারারাত ঘুম নেই আকিবের। ভাবতে ভাবতে রাত অনেক হয়েছে। মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা হলো সেহরির সময় হয়েছে। এখন রাত তিনটা। আকিব বিছানা ছেড়ে সেহরী খেয়ে নেয়। তারপর নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পূর্বের আকাশ আস্তে আস্তে ফর্সা হতে লাগলো। পাখিরা কিচিরমিচির ডাকছে। সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব প্রকৃতি আলোকোজ্জ্বল। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। সবাই যে যার কাজে বেরিয়ে পড়লো। আকিবও পত্রিকার বোঝা নিয়ে শহরের অলিতে গলিতে ছুটে। শহরের অলিতে গলিতে তার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দেয়। আজই শেষ দিন। কাল সে বাড়ি যাবে। আজ যা সংগ্রহ হবে তা দিয়ে ঈদের খরচ করবে। মরিয়মের জন্য লাল জামা আর



www.pathagar.com

মনে তার খুব আনন্দ। সব মিলে প্রায় পনের 'শ টাকা হয়েছে। এরই মধ্যেই ইফতারের সময় হয়ে গেল। ইফতার সেরে নামায আদায় করেই সে কেনা-কাটা শেষ করবে। মার জন্য শাড়ি, মরিয়মের জন্য একটি লাল জামা, আর তার নিজের জন্য একটি কুরআনের তাফসির কিনতে হবে।

মনে খুব আনন্দ আকিবের। ভোরের ট্রেনেই সে রওয়ানা করবে। রাতে সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। সবাইকে নিয়ে এবারের ঈদের আনন্দটা ভালই হবে। বাটালি হিলের পাশ দিয়ে হাঁটছে আকিব। সামনের বড় রাস্তা ধরে আর কিছুদূর গেলেই তার বাসা। যেখানে সে আর আরিফ এক সাথে। হঠাৎ দু'জন লোক একটা ছোরা বের করে তার গতিরোধ করলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আকিবকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে গেল। আকিবের রক্তাক্ত লাশ মাটিতে পড়ে রইলো। রক্তে রঞ্জিত হলো বাটালি পাহাড়ের মাটি।

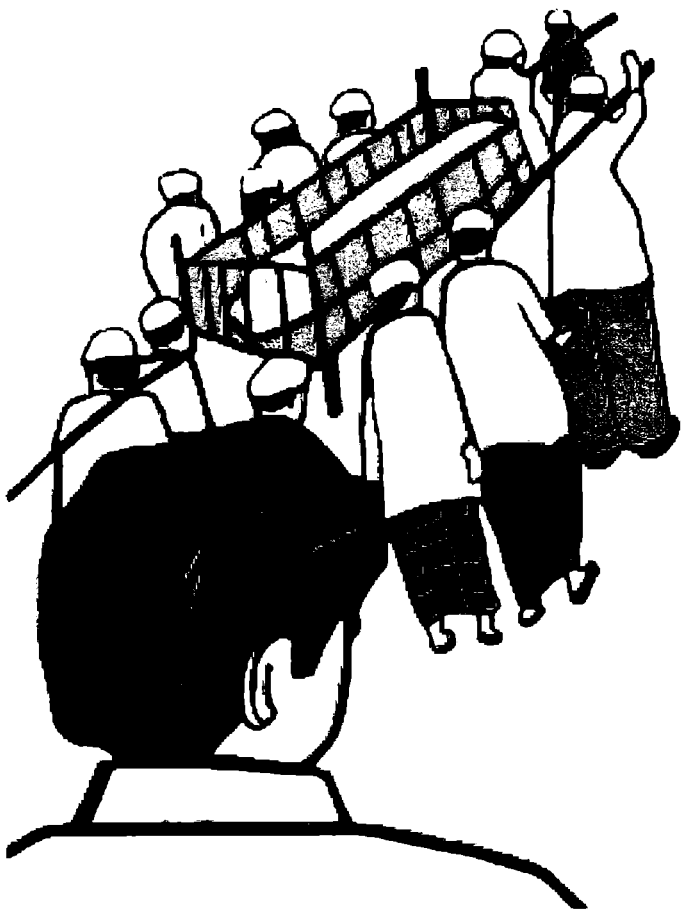

পরদিন সকাল বেলা। আজ শেষ রোযা। আজই ঈদের চাঁদ দেখা যাবে। কাল ঈদ। মরিয়ম আর মা অপেক্ষা করছে আকিবের জন্য। কখন আসবে আকিব। মরিয়ম একটু পরপরই বড় রাস্তার দিকে যায়। ভাইয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে।



www.pathagar.com

কোন খবর নেই। হঠাৎ নজু মামা হন্তদন্ত হয়ে আকিবদের ঘরে ঢুকলেন। মামা তার কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপিত করতে চাচ্ছে। কিন্তু কণ্ঠের স্বর বিদ্রোহ করছে। ক্রমশ মামার গলা ভিজে আসছে। মরিয়ম মামার কাছে এসে দাঁড়ালো। মা জিজ্ঞেস করছে, কিরে নজু কি হয়েছে, তুই অমন করছিস কেন?

–না বুবু, মানে, আর বলতে পারলো না নজু মামা।

–জানো মামা, আজকে ভাইয়া আসবে। আমার জন্য নতুন লাল জামা আনবে। এবার ঈদে খুব মজা হবে, তাই না মামা।

মামা মরিয়মের কথায় কিছুটা চমকিত। শক্ত করে ধরলেন মরিয়মের হাত। মামার হাত প্রচণ্ড কাঁপছে। ফলে মরিয়মের শরীর ও কাঁপছে। মামার সেই ধরার মধ্যে যেন একটা সান্ত্বনা দেয়া ছিল। ছিল অভয় দেয়া। কিন্তু কিসের অভয়। মামা হাত বাড়িয়ে মরিয়মের হাতে একটি রক্তমাখা জামা তুলে দিল। এই জামা শহীদ আকিবের রক্তমাখা জামা। মরিয়মের বুঝতে আর দেরি হলো না। নিশ্চয়ই কোথাও কোন উলোট পালোট হয়ে গেছে। ভাইয়ার কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ততক্ষণে মিনহাজ ভাইও এসে পৌঁছলেন। বিধ্বস্ত চেহারা, এলোমেলো চুল, মামার মতো গম্ভীর। সে মাকে ডেকে সব খুলে বললেন। বলতে বলতে পাড়া প্রতিবেশীদের ভিড় জমে গেছে আকিবদের বাড়ির সামনে।

ঈদের চাঁদ দেখা গেছে। ছোট বড় সবাই আকাশে চাঁদ দেখছে। সারা পাড়া জুড়ে হইহই রইরই। সবার ঘরে আনন্দ। কিন্তু মরিয়মদের ঘরে আনন্দ নেই। ঈদের চাঁদের দিকে না তাকিয়ে সবাই তাকিয়ে আছে আকিবের লাশের দিকে। মা মরিয়মকে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন। বাড়ির অন্যরা মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

ট্রাকে আকিবের লাশ নিয়ে এলো তার বন্ধুরা। মোড়ের বাজারের দক্ষিণ পাশে আকিবদের বাড়ির সামনের রাস্তায় শব্দ করে এসে দাঁড়ালো বিশাল পাঁচটনি হিনো ট্রাকটি। তার ওপর শহীদ আকিবের লাশ।

তারপর জানাযা শেষে আকিবকে দাফন করা হলো। আকিবের বন্ধুরা তার মায়ের কাছে এলেন। ডুকরে কেঁদে ওঠে বললেন, মা-মাগো, দেখো তুমি এক আকিব হারিয়েছ। আজ শত আকিব তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাগো আমাদের দোয়া করো মা, আমরা যেন আকিব হত্যার বদলা নিতে পারি। সাথে সাথে মা সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে কান্না জড়িতকণ্ঠে দোয়া করলেন।



www.pathagar.com

# রমজানের চান

ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে গাজীমুড়া গ্রাম। নদীর দুই পাড়ে সারিবদ্ধ রকমারী রঙবেরঙের গাছগাছালি। আঁকাবাঁকা নদীর বাঁকে পাল তুলে নৌকা বইছে দূর গাঁয়ে। চারদিকে পাখ-পাখালীর সুমধুর কলরব। ঝির ঝির হাওয়ায় ঢেউয়ের মত দুলছে সবুজ বরণ ধানের শীষ। সব মিলে কি অপরূপ বিকেলের পরিবেশ।

রিয়াজ আজ রোযা রেখেছে। আজ শেষ রোযা। সে আজকেরটাসহ দশটি রোযা রেখেছে। আব্বু-আম্মু তাকে রোযা রাখতে দেয় না। ফলে সেহরির সময় কেউ তাকে ডাকে না। কিন্তু হাড়িপাতিলের টুংটাং শব্দ পেলেই সে উঠে যায়। আব্বু-আম্মু রাগ করলেও সেহরি না খেয়ে ঘুমাতে যায় না। ছোট হলেও তার মধ্যে কবরের ভয় কম না। মক্তবের হুজুর ছমির মুন্সী বলেছেন– রোযা না রাখলে আল্লাহ গুনাহ দেবেন।



www.pathagar.com

আজ তার মনে খুব আনন্দ। কাল ঈদ। আব্বু বেতন পেয়েই শহর থেকে সুমাইয়া আপু আর তার জন্য নতুন জামা কাপড় নিয়ে এসেছেন। নতুন জামা-কাপড় পরে কাল ঈদের মাঠে যাবে। রাজুদের সাথে কোলাকুলি করবে। এক সাথে ঈদের নামাজ পড়বে। কত ভাবনাই না মনের ভেতর উঁকি ঝুঁকি মারছে।

পড়ন্ত বিকেল। রাজু তার বন্ধু মামুনের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির অনেক দূর চলে এসেছে। রোদে সারা মাঠ যেন নেতিয়ে পড়েছে। এক ঝাঁক বুনো টিয়ে মাথার ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। নদীর পাড়ে খোলো মাঠে একদল কিশোর একটা আধ ছেঁড়া ফুটবল নিয়ে খেলছে। এ চমৎকার বিকেলটা রাজুর মনটাকে উদাস করে তুললো। কিছুক্ষণ পর সূর্যটা ডুবে যাবে। তার খুব ইচ্ছা আব্বু-আম্মুর সাথে বসে ইফতার করবে।

ইফতারের সময় হতে তেমন দেরি নেই। হেঁটে গেলে ইফতারের সময় পার হয়ে যাবে। মামুনকে বিদায় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালো রাজু। বাড়ি ফেরার জন্য রিক্সার খোঁজ করছে। কিন্তু অনেক দূর তাকিয়েও কোন রিক্সার খোঁজ পেল না।

এমন সময় টুংটাং শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালো রাজু।

কনাই যাইবেন চোড ভাই, আঁর রিক্সায় উডেন। এতক্ষণ পর একটা খালি রিক্সা পেয়ে মনটা আশ্বস্ত হলো।

ঃ গাজীমুড়া যাবে? বললো, রাজু।

ঃ আইয়েন আইয়েন, আঁরে হাঁচটেঁয়া দেয়ন লাইগবো।

দ্বিধা না করে রিক্সায় উঠে বসলো রাজু।

প্রায় রাজুর বয়সী একটি কিশোর। রুগ্ন দেহ। ওর শরীরটা যেভাবে রিক্সাটাকে টেনে যাচ্ছিল তা দেখে রাজুর খুব কষ্ট হলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, কিইবা এমন বয়স হয়েছে ওর! অথচ যে হাতে কলম ধরার কথা ছিলো সে হাতে ও টেনে ধরেছে রিক্সার ব্রেক। এক-এক সময় রিক্সার পেডেলে চাপ দিতে দিতে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বিবেকের একটা তীক্ষ্ণ সুঁই যেন তার বুকে বিঁধলো। মায়া হলো। তোর নাম কিরে? জিজ্ঞেস করলো রাজু। হঠাৎ যেন ও হকচকিয়ে গেল, কি আঁরে কন? -হ্যাঁ, তোকে। -আঁর নাম রমজান। ওর কণ্ঠই শুনে মনে হলো যেন রাজুর কত দিনের চেনা। কোথায় যেন দেখেছে ওকে, হয়তো মনে পড়ছে না। ছেলেটি বলেই চলল, আরবি রমজান মাসে অইছিলাম তো তাই, তয় মায় আদর করি নাম রাইকছে রমজান। মায়ে কইছে হইলা রোযার দিন আঁর জন্ম অইছে। ইয়ারলাই মায় আদর করি আঁরে রমজানের চান কই বোলাইতো।

রমজানের কথা শুনতে ভালই লাগছিল রাজুর। জিজ্ঞেস করলো, তোর বাবা কি করে? হঠাৎ করুণ দৃষ্টিতে পেছন ফিরে তাকালো রমজান। আঁর বাবা নাই চোড ভাই। বাবা আদমজী মিলে কাম কইত্তো। শ্রমিকেরগো দাবি দাওয়ার লাই আন্দোলন অইছিলো, মিছিল অইছিলো। বাবা গেছিল মিছিলে -মালিকপক্ষ গুলি চালাইলো, অগ্যা গুলি আই বাবার বুকে লাইগলো। লগে লগে বাবার মৃত্যু অইলো। অন আঁই আর মা ছাড়া সংসারে কেউ নাই। বলতে বলতে তার চোখ



www.pathagar.com

থেকে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগলো। রাজু বুঝতে পারলো ওর কণ্ঠ কাঁপছে। ততক্ষণে রিক্সা বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছে। নিজের অজান্তেই ওকে ভালবেসে ফেলেছে রাজু। ওর করুণ চাহনির দিকে তাকিয়ে তার মায়া হলো। রিক্সা থেকে নেমে পাঁচটি টাকা হাতে দিয়ে বললো, কাল সকালে আমাদের বাড়িতে আসিস। মাথা নেড়ে বিদায় নিল রমজান।

ঘরে ঢুকতেই সুমাইয়া আপু জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গিয়েছিলি? আব্বু-আম্মু তোকে ইফতার করতে খুঁজছে।

আব্বু-আম্মু সাথে টুপি মাথায় দিয়ে বসে গেল রাজু। চারদিকে শোর উঠলো। চার দিকে ছোটরা নাচতে নাচতে বলছে, চাঁদ উঠেছে! চাঁদ উঠেছে! রাজুরও যেন আনন্দ ধরে না।

রাত হয়েছে। আম্মুর পাশে শুয়ে রাজু রমজানের কথা ভাবছে। কাল সকালে এলে আম্মুকে বলে তার গত ঈদের জামাটা রমজানকে দিয়ে দেবে। সেমাই চিনি দিয়ে বাড়ি পাঠাবে। এক সময় ঘুমের রাজ্যে ডুবে গেল।

ভোর হয়েছে। চারদিকে পাখির কিচিরমিচির শব্দ। সুমাইয়া আপু জায়নামাজে বসে সুর করে কুরআন শরীফ পড়ছে। আপু ভারি মিষ্টি করে কুরআন পড়ে। রাজু বিছানায় শুয়ে ঘুম ঘুম চোখে সুমাইয়া আপুর কুরআন পড়া শুনিছিল। পাশের রুম থেকে আব্বুর নামাজ পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। রাজুর আর লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছে হলো না। ঘুম থেকে উঠে অজু করে আব্বুর পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলো। রাজু প্রতিদিন আব্বুর সঙ্গে রোজ ভোরে ওঠে নামাজ পড়ে। তারপর সুমাইয়া আপুর পাশে চুপ করে বসে থেকে কুরআন পড়া শোনে। কিন্তু ভোরে ডেকে দিতে বললে বাধ সাধে আম্মু। আম্মুর কথা, তুমি এখনো ছোট। অত ভোরে উঠলে ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ করবে।

নামাজ শেষ করতেই রমজানের কথা মনে পড়ে গেল রাজুর। অপেক্ষা করছে কখন আসবে। কিন্তু যে আসে না। এর মধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। সালাম, ইমন, রিয়াদ, সাকিব, এরা সবাই নতুন জামাকাপড় পরে রাজুকে নিতে এসেছে। ওদের বাড়িতে সেমাই খেয়ে সবাই মজা করে এক সাথে ঈদের মাঠে যাবে। কিন্তু তার যে মন ভাল নেই। রাজুদের সাথে গেল না। মা এসে বকা দিল, কি হলো মুখটাকে আলুর মতো করে বসে আছ কেন? জামা কাপড় পরে বন্ধুদের সাথে যাও। অগত্যা নতুন জামা কাপড় পরে ঈদের মাঠে গেল। নামাজ সেরে বাড়ি এসেই আপুকে জিজ্ঞেস করলো, সুমাইয়া আপু, আমাকে একটি ছেলে খোঁজ করেছে। কই নাতো, জবাব দিল সুমাইয়া। মাথার ভেতর রমজানের কথা কিলবিল করছে। মনে মনে বলতে লাগলো, বোকা ছেলে। আসলে না কেন। আসলে তো আম্মুকে বলে তোর মার জন্য একটা নতুন কাপড়ও নিয়ে দিতে পারতাম। মা জিজ্ঞেস করলো, কিরে বিড় বিড় করে কি বলছিস? -কই না তো। জবাব দিল রাজু।

অপেক্ষা করতে করতে দিন পার হয়ে রাত এসে গেছে। রমজান আর আসেনি। ফলে রাজুর ঈদের আনন্দটাও মাটি হয়ে গেল। সারা রাত আর চোখে ঘুম আসেনি। ভাবে ছেলেটার প্রতি এত মায়া হলো, কিন্তু সে আসলো না কেন?



www.pathagar.com

একে একে ৩/৪ দিন পার হয়ে গেল। রমজানের সাথে রাজুর আর দেখা নেই। রাজু রমজানকে ভুলতে পারছে না। রাতে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে বলে, রমজান তুই আসলি না কেন? তোকে ছাড়া যে আমি থাকতে পারি না। আমার দাওয়াত তুই গ্রহণ করিসনি কেন। আমার আম্মু বকা দেবে এ ভয়ে বুঝি আসিস নাই?

সেদিন স্কুল থেকে ফিরছিল রাজু। হঠাৎ কি মনে করে রাজা মিয়ার চায়ের দোকানে ঢুকলো। রাজা মিয়ার দোকানের টেবিলের ওপর রাখা খবরের কাগজের ওপর চোখ পড়তেই রাজুর মাথা ঘুরে উঠলো। তার চোখের সামনে যেন সেই লাইনগুলো বারবার দোলা দিতে লাগলো, "ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে বালকের মৃত্যু।" ইনসেটে দেখলো রাজুর চেনা মুখ রমজান।

আর স্থির থাকতে পারলো না রাজু। ছুটে গেল সে রমজানদের বস্তিতে। কিন্তু কেউ তার খোঁজ দিতে পারলো না। ছুটে গেল হাসপাতালে। দুপুরের প্রখর রোদে কি যেন একটা শূন্যতার আভাস দিচ্ছিল তাকে। কে যেন তাকে বলছে, রমজানকে আর কখনো দেখতে পাবে না। রাজু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই। এতক্ষণে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে। সাদা কাপড়ে ঢাকা রমজানের লাশ দেখে চমকে উঠলো রাজু। তার রক্তাক্ত মুখটি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন বলতে চাইছে, আমাদের হাতে তুলে দিও না শ্রমের হাতিয়ার। তুলে দিও না রিক্সার ব্রেক। আমরা ঈদের খুশি উপভোগ করতে চাই। আমরা ভালবাসার মাঝে বাঁচতে চাই।

হতাশ মনে বাড়ি ফিরে এলো রাজু, মনটা মোটেও ভাল লাগছে না। রাতে পড়ার টেবিলে বই খুলে বসে আছে। পড়ায় মন নেই। আবার কে যেন তাকে বলে যাচ্ছে, আমরা ভালবাসার মাঝে বাঁচতে চাই, আমরা ঈদের খুশি চাই। আম্মু রাজুর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে। আম্মু বললেন, পড়তে ভাল না লাগলে ছাদে গিয়ে আপুর সাথে গল্প করো।

সুমাইয়া আপু ছাদে তার এক বান্ধবীকে নিয়ে মাদুর পেতে বসে বসে গল্প করছে। রাজু ছাদে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে সুমাইয়া আপুর পাশে শুয়ে পড়লো। আকাশের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে সে। সে দেখছে অসংখ্য তারা মিটমিট করে জ্বলছে। তাদের মাঝে যেন রমজানকেও দেখতে পেল। দেখলো তার কষ্টভরা হাসি মুখটাকে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলো রাজু, "কেমন আছিসরে রমজানের চান? কেমন আছিস?"



www.pathagar.com

# শিমুলতলীর বদ্ধভূমি

সরু লম্বা লম্বা তালগাছ, বাবলার ঘন ছায়া ঘেরা পুকুরের চার ধার। জায়গায় জায়গায় আঁটি সরার ঝোঁপ। লাল টস টসে ফল ধরে থাকে। এক কোণে বেতসের ঝোঁপ। সেখানে লুকিয়ে থাকে ডাহুক পাখি। মাছরাঙারা থাকে উদাস শিমুল গাছটার নিচু ডালে। টুপ করে মাছ ধরে। সরপুঁটির ঝাঁক সন্তর্পণে চলাফেরা করে পদ্মপাতার নিচ দিয়ে। কলমির ডগায় বসে থাকে জল ফড়িং। রোদের সোনালী আলোয় ঝলমল করে তালপুকুরের পানি। দক্ষিণের বাঁশবন থেকে আসে বাতাস। থিরথির করে কাঁপে তালের গোলপাতা। তালপুকুরের উত্তর কিনারেই রৌমারী সীমান্ত। সীমান্তের কোল ঘেষেই একটি গ্রাম। নাম তার শিমুলতলী। এই গ্রামেই বাস করে রহিমদ্দী ও ছমিরনের পরিবার। একমাত্র ছেলে মন্তুকে নিয়ে তাদের তিনজনের সংসার। আজ ছমিরনের মন খুশি খুশি। দুপুরে মন্তু শহরে চলে গেছে। ছেলে চলে যাবার পর থেকে ছমিরনের বুকের ভেতরটা পাঁকা ঠেকছে। তবুও মনটা খুশি। তার মন্তু কাজ পেয়েছে। এবার তাদের সংসারের কষ্ট কিছুটা দূর হবে।



www.pathagar.com

কয়দিন ধরে পাদুয়া সীমান্তে বিএসএফ এর আনাগোনা বেড়েছে। দুই দিকে উত্তেজনা। ফলে রৌমারী সীমান্তে ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। দলে দলে লোকেরা পালাচ্ছে আরো ভেতরের গ্রামের দিকে। একটা নিরাপদ আশ্রয় চায় ওরা।

রহিমদ্দী সারাদিন সবাইকে বোঝান। পালাবেন না আপনারা। ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না। প্রয়োজনে উচিত জবাব দেবো আমরা। আল্লাহ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। অনেকেই পালিয়ে গেছে গ্রাম ছেড়ে। বিকেল বেলা। গ্রাম প্রায় শূন্য। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। মাত্র কয়েকজন সাহস করে থেকে গেছে। এরা গ্রাম ছেড়ে যায়নি এখনো। একটা আতংক সবাইকে যেন তাড়া করছে। এই বুঝি বিএসএফ এলো। চারদিকে চুপচাপ সুনসান। বাতাসটা যেন গুম মেরে আছে। বিলের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নুরু ব্যাপারীকে। ভারতীয়দের দেখলেই খবর দেবে সে। মাস্টার বাড়ির দহলিজে বসে আছে সবাই। কি যেন কথাবার্তা হচ্ছে চাপা স্বরে। এর মধ্যে রাতের আঁধার নেমে এলো, রহিমদ্দী বাড়ি ফিরে এলো।

অনেকদিন পর ছমিরন রান্না করতে বসেছে। ডাঁটা তরকারীগুলো কুচো কুচো করে কেটে ছমিরন নুন দিয়ে মাখলো। তারপর চাল ধুতে বসলো। হোক মোটা মোটা আর গুমোট গন্ধ, তবু চাল তো। আজ প্রায় দশদিন পর ছমিরন চালের ভাত রাঁধতে বসেছে। মন্তুর বাপের শরীর ভাল না। জ্বরে ভুগছে। ছমিরন নিজে এ বাড়ি নিজে এ বাড়ি ও বাড়ি ধান ভেনে, এটা সেটা কাজ কাম করে এক আধসের চাল যা পেয়েছে তা চুলোয় বসিয়েছে। উঠোনের মরিচ গাছ থেকে টিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো লাল টুকটুকে কয়েকটা পাকা মরিচ তুলেছে। এখন যদি একমুঠো চিংড়ি মাছ হতো তা হলে খাসা করে চচ্চড়ি রাঁধতো ছমিরন। কিন্তু মন্তুর বাপের জ্বর জ্বর ভাব। তাকে তো মাছ ধরার কথা বলা যায় না। আগে হলে মন্তুর বাপে নিজেই ছাঁকা দিয়ে চিংড়ি মাছ ধরে আনতো।

ঘরে তেল নেই। সরষের তেল চোখেই দেখে না আজ কতকাল। মন্তু বলেছে এবার যখন আসবে, শহর থেকে তখন সয়াবিন তেল কিনে আনবে। কঞ্চির জাল ধরিয়ে ছমিরন ভাত চড়িয়ে দিল। মন্তুর বাপ হুকো হাতে এসে চুলোর পাশে বসলো। চুলো থেকে আগুন তুলতে তুলতে মন্তুর বাপ বললো, শরীলে জুত নাই মন্তুর মা। তা না অইলে দুগা মাছ ধরতাম।

সত্যিই মানুষডা অনেক দিন ধইরা জ্বরে ভুগছে। ভুগে ভুগে অমন শক্ত সামর্থ মানুষডা কত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেল। মন্তু বলেছে, আব্বার আসল অসুখ হলো, না খাওয়া। পেটে ভাত থাকলে শরীর আপনেই ভাল থাকে। তা ঐ পেটের তাগিদেই তো মন্তু আমার অল্প বয়সে শহরে গেছে কাজের ধান্ধায়।

ভাত নামিয়ে ছমিরন ডাঁটার চচ্চড়ি বসিয়ে বসিয়ে দিল। একটুক্ষণের মধ্যেই কাঁচা মরিচের ঝাল ঝাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। মন্তুর বাপের জিবে পানি এল। হুকোতে কয়েকটা টান দিয়ে বলে, আর কয়দিন। মন্তু যদি রুজি রোজগার কইরা মহাজনের কাছথন বন্ধকী জমিগুলান ছাড়াইতে পারে তয় সুখের মুখ দেখুম।

বাঁশের খুন্তি দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি নাড়তে ছমিরন বললো, হ্যাঁ। তার ঘোলাটে চোখেও অনেক



www.pathagar.com

আশার আলো। দু'জনেই কিছক্ষণ চুপ থাকে, কোন কথা বলে না। বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনকি ছুটছে। খড়ের ঘরের চালগুলোতে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে কেমন যেন ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে। ঘরের পেছনে আলতাপাটি পুঁইশাকের লতা পেঁচানো জিওল গাছটায় বসে কুক কুক করে কি যেন একটি পাখি ডাকছে। চৌধুরী বাড়ির পুকুর পাড় থেকে শেফালী ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। সারাটা গ্রাম যেন এই সন্ধ্যা রাতেই ঘুমে ঢলে পড়েছে। রৌমারী বিডিআর ক্যাম্পের পাশেই বড় বিল। বিলে এবার ইরি ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। প্রতিবছর ভারতীয়রা বিএসএফ এর সহযোগিতায় সব ধান কেটে নিয়ে যায়। ফলে রাত হলে সব চাষীরা ছোট ছোট মাচা বেঁধে পাহারা দেয়। বিলের মধ্য থেকে কার যেন গানের সুর কান্নার মতো গুমরে ভেসে আসছে। রহিমদ্দী কান খাড়া করে জানার চেষ্টা করছে কার গলা। মনে হয় মকুম বয়াতির গলা।

সানকিতে ভাত বাড়লো ছমিরন। নীরবে খাওয়া দাওয়া সারলো দু'জনে। অনেক দিন পর ভরা পেট ভাত খেয়ে শোকার আলহামদুলিল্লাহ বলে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিল ছমিরন। রহিমদ্দী নামাজ সেরে বিছানায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘরের পেছনের গাছটা থেকে আর পাখির ডাক শোনা যায় না। সেটাও ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। কিন্তু বিলের পাড় থেকে মকুম বয়াতির কান্না-কাঁপা গানের সুর এখনও শোনা যাচ্ছে। যেন আসমান জমিন তার গানে কাঁপছে। অঘোরে গুমাচ্ছে রহিমুদ্দী। ছমিরনের চোখে ঘুম নেই। মনে পড়ছে অনেক কথা। মনে পরছে মন্তুর কথা। অনেক রাত পর্যন্ত তার চোখে ঘুম আসছে না। আশে-পাশের ঘরে সবাই ঘুমাচ্ছে। তাদের কারুর নাক ডাকছে, কেউ কেউ স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে বিড় বিড় করে। মনে মনে ভাবছে ছমিরন। এত করে সাধলাম, আজকের দিনটা বাড়িতে থেকে যা বাপ। কিন্তু ছেলেটা শুনল না। ছমিরন জিজ্ঞেস করেছিল, টাউনে কি কাম পাইছস বাবা? শরীর এত শুকাইয়া গেছে ক্যান? খুব খাটনির কাম বুঝি? মন্তু মা'র কথা শুনে হেসেছে। রিকসা চালানোর কথা সে বলেনি মা'কে। বললে মা হয়তো কষ্ট পাবে। মন্তুর মা বিড় বিড় করে বলে, অত কষ্ট কইরা কাম নাই বাপ। অন্য কোন চাকরির চেষ্টা কর। কিন্তু মন্তুর মা তো জানে না, শহরে চাকরি পাওয়া কত শক্ত। আজকাল তো দেশপ্রেমিকদের কদর নেই। সারাদিন রিকসা চালানোর পর মন্তু নাইট কলেজ পড়ে। কলেজের বন্ধুরা তাকে মোটেও পছন্দ করে না। কারণ সে যে অন্যায় করে না।

রাত গভীর হয়েছে। পুব আকাশে শুকতারা উঠেছে। হঠাৎ থেমে গেল মকুম বয়াতির গানের শব্দ। গরের বাইরে কার যেন ছুটাছুটি শব্দ শুনা গেল। রহিমুদ্দীর ঘরের দরজা ধরে নাড়া দিল। মন্তুর বাপ, ও মন্তুর বাপ, ঘুমিয়ে গেছ। তাড়াতাড়ি ওঠ। এক্ষণই সব শেষ হয়ে যাবে। ছমিরন ঘর থেকে জিজ্ঞেস করলো, কেডায় আপনে? আমি নুরু ব্যাপারী, বুবু। মন্তুর বাপ'রে জাগাইয়া দাও। মন্তুর বাপ হুড়মুড় করে ঘুম থেকে ওঠে বাইরে এলো। কি অইছে নুরু ভাই? বিএসএফ এর শত শত সৈন্য গ্রামে ঢুকছে। এবার আর রক্ষা নাই ভাই। ঘরদোর সব জ্বালিয়ে দেবে। কেঁদে কেঁদে বললো নুরু ব্যাপারী। ভয়ে নীল হয়ে ওঠে সবার মুখ। এবার কি হবে? আর বুঝি নিস্তার নেই।



www.pathagar.com

সবাই ভীত সন্ত্রস্ত রহিমুদ্দী নুরুকে নিয়ে রাস্তার মাথায় গেলেন। ছমিরন অজু করে এসে নামাজের বিছানায় বসলেন। দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন। ইতেমধ্যে অনেকেই পালাতে শুরু করেছে। কিন্তু মন্তুর বাপ দাঁড়ালেন সবার সামনে। সবাইকে নিয়ে এলেন বাঁশবনে। হলুদ ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সবাই। এদিকে বিডিআর ক্যাম্পে খবর দেয়া হলো একজনকে দিয়ে। মাথা উঁচু করে দেখালো সবাই। দলে দলে আসছে ভারতীয় বিএসএফ। উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটে সময়। ভারতীয় সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়লো রৌমারীর গাঁয়ের ভেতর। খুঁজছে ওরা গাঁয়ের মানুষদের। ঠাস-ঠাস গুলির আওয়াজ। কান পেতে শুনল সবাই। তার পরেই দেখতে পেল দাউ দাউ করে আগুনের লেলিহান শিখা। জ্বলে উঠলো গ্রামের নীরিহ মানুষের বাড়িঘর। ওরা পুড়িয়ে দিচ্ছে গ্রামকে গ্রাম। আওয়াজ এলো বিডিআর ক্যাম্প থেকে। নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার। সাথে সাথে গুলির শব্দ।

হলুদ বনের ঝোঁপ সরিয়ে তাকালো সবাই। এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ রক্ষাকারী বিডিআর জোয়নরা। হঠাৎ কানে ভেসে এলো গুলির শব্দ। সবার চোখ ওদিকে। টলতে টলতে পড়ে গেল দু'জন বিডিআর জোয়ান। বুকে লাল রক্ত। গুলি করেছে ভারতীয় হানাদাররা। চোখ ফেটে পানি এলো সবার।

চারদিকে চুপচাপ। থমথমে নিস্তব্ধতা। বাতাসে কেমন পোড়া গন্ধ। নারায়ে তাকবির বলে দশজন জোয়ান উঠে দাঁড়ালেন। দু'জন শহীদ বিডিআর জোয়ানের লাশের পাশে। শহীদের দেহ নিষ্প্রাণ নিথর হয়ে পড়ে আছে। বুকে বেশ কয়েকটি ক্ষত। রক্ত ঝরছে এখনো। পেছনে জ্বলছে গ্রাম। সামনে শহীদ বিডিআরদের লাশ! আপনা-আপনি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে নারায়ে তাকবির বলে শরীক হয় বিডিআরদের সাথে শত শত গ্রামবাসী। আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে নারায়ে তাকবিরের শব্দে। শত শত গ্রামবাসী এক সাথে বলে উঠলো, জীবন দেবো তবুও দেশের মাটি দেবো না। নারায়ের তাকবিরের শব্দে শত্রুদের অস্ত্র হাত থেকে পড়ে গেল। প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। চার দিকে বিজয় মিছিল।

রহিমুদ্দী বাড়ি এলেন। তার শূন্য ভিটা পড়ে আছে। সবশেষ। তছনছ হয়ে গেছে তার সংসার। নামাজরত অবস্থায় আগুনে দগ্ধ হয় ছমিরন। রহিমুদ্দীকে সবাই সাহস যোগাল। ভয় নেই মন্তুর বাপ, সব হারালেও আমরা দেশ হারাইনি। আমরা বীরের জাতি। জীবন দিতে জানি, কিন্তু দেশের মাটি দিতে পারি না।



www.pathagar.com

# চান্দির মালা

কাশিনগর গ্রাম। গ্রামটির দুই দিকে খাল। বর্ষা মওসুমে খালে প্রচুর পানি হয়। খালের উপর বাঁশের সাঁকো। এই সাঁকো দিয়ে গ্রামের মানুষ সদর রাস্তায় ওঠে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সাকোঁর উপর ওঠে। লাফ দেয়। পানিতে পড়ে। সাঁতার কাটে। ডুব দিয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যায়। খালে ভাসতে থাকে টবটবি পাতা। এর ফাঁকে ফুটে থাকে শাপলা ফুল। অনেকে সাঁতার কেটে-শাপলা তোলে। ডুব দিয়ে মাটির নিচ থেকে শালুক তুলে খায়।

বর্ষা শেষ হলে খালে পানি কমে যায়। তখন মাছ কিলবিল করতে থাকে। পাড়ার সব ছেলে মেয়ে মাছ ধরে। পাতিল ভর্তি করে মাছ নিয়ে বাড়ি আসে। খোনকার বাড়ির চান্দিও সবার সাথে মাছ ধরতে যায়। সাথে যায় তার ছোট ভাই নুরা। চান্দি খালে নামে মাছ ধরতে। হাতায়ে হাতায়ে অনেক মাছ ধরে। এক এক বার কই, পুঁটি নানা জাতীয় মাছ ধরে নুরার দিকে ছুঁড়ে মারে। নুরা মাছ নিয়ে ডুলায় ভরতে ভরতে দিশাহারা হয়ে যায়। এক সময় ডুলা ভর্তি মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরে। মাছ দেখে মা যে কত খুশি হতো। মা ভাল করে রান্না করে। ওরা মজা করে খায়।



www.pathagar.com

শীতের দিনে গাছে ঝুলতে থাকে খেজুর রসের হাড়ি। চান্দিদেরও দু'টি গাছ আছে। উত্তর বাড়ির রঙ্গু মিয়া গাছে হাড়ি পাতে। সে অর্ধেক রস নিয়ে যায়, আর বাকী-অর্ধেক চান্দিরা খায়। সকাল হলে রঙ্গু-মিয়া গাছ থেকে হাড়ি নামায়। চান্দি আর নুরা পাটখড়ি ডুবিয়ে মজা করে রস খায়।

চান্দিরা গরিব। আয় রোজগার করার মতো কেউ নেই। বছর দুই আগে বাবা মারা গেছে। মা এবাড়ি ওবাড়ি ঝিয়ের কাজ করে ছেলে মেয়ে দু'টোর মুখে আহার তুলে দেয়। অনেক সময় না খেয়েও থাকতে হয়। এ নিয়ে মা রাতে শুয়ে গুনগুন করে কাঁদে। তার দু'চোখে ঘুম আসে না।

বেলা হলে চান্দি আর নুরা মাঠে চলে যায় ধান কুড়াতে। মাঠে পাকা ধান ঝরে পড়ে। ওরা ওসব ধান টুকিয়ে ওঁড়া ভর্তি করে বিকাল হলে বাড়ি ফিরে। এক দেড় মাস মাঠে ধান কুড়ায়। এতে যা পায় তাতে দু'এক মাসের খোরাকের বন্দবস্ত হয়ে যায়। মা অনেক সময় কিছু ধান গোলার ভেতর পুরে রাখে। এ দিকে মাঝে মধ্যে নানা রকম পিঠা তৈরি করে। তবুও যেন তাদের সংসারে সুখের সীমা নেই।

চান্দির আসল নাম চলেমা। মা আদর করে ডাকতেন চান্দি। মা বলেছেন, চান্দি ছোট বেলায় চান্দের মত সুন্দর ছিল। এ কারণেই নাকি মা তাকে চান্দি বলেই ডাকতেন। এক সময় চান্দিদের সংসারে অভাব ছিল না, সবাই আদর দিয়ে ভরে দিত তাকে। বাবা ছিলেন জুট মিলের শ্রমিক। যা রোজগার করতেন তা দিয়ে চারজনের সংসার ভাল ভাবেই কাটতো। কিন্তু বিধি বাম। মিলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলো। মিল মালিকের সাথে শ্রমিকদের মারামারি হলো, বাবা পায়ে গুলি খেয়ে মাজুর হয়ে গেল। বছর দুই পর বাবা মারা গেলে মা তাদের একমাত্র অভিভাবক।

কিন্তু এই সুখের মধ্যেও এক সময় আগুন ধরলো। পাড়ায় দেখা দিল কলেরা। অনেক লোক আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আক্রান্ত হলো চান্দির মা। দু'দিন পর মা-ও বিদায় নিল। চান্দি আর নুরা এখন এতিম। আপন বলতে কেউ নেই। সেবার বন্যায় ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে গ্রাম জুড়ে নিরব দুর্ভিক্ষ। সাহায্যের হাত বাড়ানোর মতো লোকও গ্রামে নেই। শুধু অভাব আর অভাব।

ক্ষুধার তাড়নায় চান্দিরা কাতর। ছোট ভাই নুরাকে হাতে করে নেমেছে ভিক্ষায়। তা ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু এতেও তাদের চলে না। যে বাড়িতেই যায় সবাই বাঁকা চোখে দেখে। রাজ্যের চিন্তা চান্দির মাথায়।

বলি বাড়ির হামিদ কানা ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা করে। দু'ভাই বোন এখন হামিদ কানার সাথে ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা করে। হাসানপুর স্টেশন থেকে অনেক সময় কমলাপুর পর্যন্ত চলে যায়। রাত হলে স্টেশনে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে থাকে। এক রাতে কমলাপুর স্টেশনে ঘুমন্ত অবস্থায় জিআরপি পুলিশের বেতের ঘা খেয়ে স্টেশনের পাশেই টিটিপাড়া বস্তিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাদের সাথে পরিচয় হলো, ফরিদা, কুলসুম আরা অনেকের সাথে। বস্তির এসব ছেলেমেয়েরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফুল বিক্রি করে। চান্দিও এ ব্যবসা শিখে ফেলে। দু'ভাই বোন ভোর



www.pathagar.com

রাতে চলে যায় রমনা পার্কে। গাছ থেকে ঝরে পড়া নানান ফুল কুড়িয়ে এনে মালা গাঁথে। তারপর শান্তিনগর, মগবাজার এসব বড় বড় মোড়ে দাঁড়িয়ে বিক্রি করে। ওরা তাদের মালার নাম দিয়েছে চান্দির মালা। মালা ভর্তি হাতটা বাড়িয়ে দেয় গাড়ির ভেতর। নেন সাব, নেন চান্দির মালা। বউত গেরান আছে। বাইত লইয়া যান।

চান্দা চায়। শহরের মানুষগো প্রতি চান্দির হিংসা লাগে। সে মনে করতো শহরের মানুষগুলো ভাল। এখন দেখে তারাও তাগো ঠকায়। ভদ্রবেশে চান্দা চায়।

শবেবরাত এলে চান্দির আনন্দের সীমা থাকে না। একদিনের সংগৃহীত রুটি দিয়ে কমপক্ষে ৫/৬ দিন চলে যায়। এবার শবেবরাতেও মজা করেছে। রুটি সংগ্রহের পর হাইকোর্টের মাজার, শিশুপার্কসহ নানা জায়গায় ঘুরেছে। শেষ রাতে বস্তিতে এসে ঘুমিয়েছে। রাজ্যের ঘুম চোখে। যে কতদিনের ঘুম কাতুরে।

কখন যে ভোর হয়ে গেছে টেরই পায়নি তারা। বরাবর সূর্য ওঠার আগেই তারা ঘুম থেকে উঠতো, কিন্তু আজ হয়েছে তার উল্টো। রাতের ঘুম আর হালকা ঠাণ্ডা। শীতের কারণেও উঠতে দেরি হয়েছে।

নুরার সেকি তাড়াহুড়া ঃ আরে বুজি তাড়াতাড়ি মালাবানা। আইজ এমনিতেই দেরি অইয়া গেছে। আইজ দিনডাই আমাগো লাইগা খারাপ। ফরিদা, কুলসুম, হানিফা ওরা সবাই মনে অয় মালা লইয়া চইলা গেছে। আইজ বেচাকিনা ভালা অইবো না। আমাগো ব্যবসা লাডে উঠবো।

গতকাল চান্দি এক লোকের কাছে মালা বিক্রি করতে গিয়ে গলা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। এক স্কুলছাত্রী তা দেখে তাকে টেনে তুললো। মেয়েটি চান্দির কাছ থেকে মালাও কিনলো। এ থেকে চান্দি যেন তার জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে। তাকে এখন নতুন দিনের স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মেয়েটি তাকে ও তার ভাই নুরাকে স্কুলে ভর্তি করে দিবে বলেছিল। চান্দির এখন এই অবহেলিত জীবনের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে। সে লেখাপড়া করতে চায়। ও চায় অন্যান্য শিশুদের মতই নতুন জামা কাপড় পরে স্কুলে যেতে। কিন্তু দারিদ্রতা তাকে শুধু পিছু টানে। ও চায় একদিন বড় শিক্ষিত হবে। ফুলের মত ঘ্রাণ ছড়াবে। ভাবনারা কিলবিল করে ওঠে মাথায়। নুরাকে বলে, আইজ একটা বই কিনমু। রাইতের বেলায় বস্তির সখিনা আপার কাছে লেখাপড়া হিকমু। তারপর নাইট স্কুল। তোরেও স্কুলে ভর্তি করমু। কি বলিস নুরা?

নুরা চান্দিকে জড়িয়ে ধরে? বুজি আমারও স্কুলে যাইতে মনলয়। কিন্তু পারি না। ক্ষুধারা খালি জ্বালা দেয়। প্রতিদিন দেহি পোলাপান স্কুলে যায়, আমারও যাইতে ইচ্ছা করে। ফুল বিক্রি করতে আঁর জীবনডাই মাডি। গাছে ফুল না ফুটলে যেমন প্রজাপতি আহে না, তেমনি আমাগো অবস্থাও তাই। আমাগোরে কেউ আদর করে না। কাইল রাইতে ওয়াজের সময় মসজিদের ইমাম সাব হুজুর কইছেন, আল্লাহর নবী নাকি এতিম শিশুগোরে ভাল বাসতেন, আদর করতেন। তা হলে আমাগোরে কেউ কেন ভালবাসে না।

এসব কথা বলতে বলতে মালা নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে দু'ভাই বোন ঢুকে যায় গাড়ির ফাঁকে। নুরার ছাই রঙের গেঞ্জি আর চান্দির লাল রঙের ফ্রক একাকার হয়ে যায় গাড়ির ভিড়ের মধ্যে তারা দু'জন হারিয়ে যায় রূপালী স্বপ্নের রাজ্য।



www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা -চট্টগ্রাম
www.pathagar.com
প্রচ্ছদশিল্পী : মহিউদ্দিন আকবর